২০০৫ সাল- আইনস্টাইনের বছর

আলোর গতিই বিশ্বে পরম

আসিফ

ষ্টিফেন হকিংকে সময়ের আপেক্ষিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন শুধুমাত্র একটি জিনিষ আছে যা পরম, তা সময় নয় বরং আলোর গতি-সেকেন্ডে ১৮৬২৮২মাইল। এটা হল আইনস্টাইনের মাস্টার ঘড়ি, যেহেতু সময় ছাড়া কোন বেগ হতে পারে না এবং আলোর দ্রুতি কখনো পরিবর্তিত হয় না। কেন আলোর গতির দ্রুতি পরিবর্তিত হয় না তার ভৌত কারণ কি তা হয়তো আমরা জানি না, তবে একে আমরা প্রকৃতির ভৌত নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়েছি।...

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্বসহ তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে পৃথিবীকে আমূল বদলে দেন। মানব সভ্যতার বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানে এটিই সবচেয়ে বৈপ্লবিক ধারণা যার মাধ্যমে স্থান ও কাল দুটি শব্দকে একীভুত করা সম্ভব হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রধানদুটি অনুমানের একটি আলোক দ্রুতির ধ্রুব অবস্থা। ২০০৫ সাল হলো আপেক্ষিক তত্তের শতবর্ষ। এই বছরকে আইনস্টাইন বছর বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

ষ্টিফেন হকিংকে সময়ের আপেক্ষিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন শুধুমাত্র একটি জিনিষ আছে যা পরম, তা সময় নয় বরং আলোর গতি-সেকেন্ডে ১৮৬২৮২মাইল। এটা হল আইনস্টাইনের মাস্টার ঘড়ি, যেহেতু সময় ছাড়া কোন বেগ হতে পারে না এবং আলোর দ্রুতি কখনো পরিবর্তিত হয় না। কেন আলোর গতির দ্রুতি পরিবর্তিত হয় না তার ভৌত কারণ কি তা হয়তো আমরা জানি না, তবে একে আমরা প্রকৃতির ভৌত নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়েছি। এই নিয়মটা প্রথম আবিষ্কার করেন আইনস্টাইন যা তার ১৯০৫সালে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে জগত সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দেয়। কিভাবে এরকম সাধারণ ধারণার পরিপন্থি অথচ আইনস্টাইনের কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল যে এরকম একটি স্বাভাবিক নিয়মকে বুঝতে এত জটিলতা সৃষ্টি হলো কেন?

তার আগে আমরা নিউটনীয় আপেক্ষিক বেগ নিয়ে একটু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

ধরি একটা ট্রেন নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকার পথে রওনা দিল ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগে। তার অর্থ দাঁড়াবে যে স্টেষনে দাঁড়িয়েছিল সে দেখবে ট্রেনটি ২৫ মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি ঐ ট্রেন বরাবর ঘন্টায় ১০ মাইল বেগে দৌড়ানো শুরু করে তাহলে সে দেখবে ট্রেনটি তার সাপেক্ষে ১৫ মাইল বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ সে যে সময়ে ২৫ মাইল যায় দ্বিতীয় ব্যাক্তি ঐ সময় ১০ মাইল যায় ফলে ট্রেন তার থেকে ১৫ মাইল বেশি যায় প্রত্যেক ঘন্টায় অর্থাৎ বিয়োগ হবে। আর যে ষ্টেষনে থাকবে সে দেখবে তার বন্ধুটা ১০ মাইল বেগে সরে যাচ্ছে আর ট্রেনটি যাচ্ছে ২৫ মাইল বেগে। আবার মনে করি ১০ মাইল লম্বা একটি ট্রেন ঐ ঢাকার পথে যাচ্ছে একই বেগে। ঐ ট্রেনের ছাদের উপর এক দুরন্ত বালক দৌড়াচ্ছে ১০ মাইল বেগে তাহলে ষ্টেষনে যে আছে সে দেখবে ট্রেন ২৫ মাইল যাচ্ছে ঘন্টায় কিন্তু সেই ট্রেনের ছাদের উপর ঐ বালক আরও ১০ মাইল পথ অতিক্রম করে ট্রেনের অপর প্রান্তে চলে গিয়েছে ফলে সে দেখবে বালকটি ঘন্টায় ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করছে, তাহলে বালকটির বেগ ঘন্টায় ৩৫ মাইল। এই হলো নিউটনের বেগের আপেক্ষিকতার নীতি। আমাদের সাধারণ জ্ঞানও তাই বলে। অবশ্য আইনস্টাইন বলেন, “আঠার বৎসর বয়সের আগে মনে যে সব সংস্কারের স্তর পড়ে যায় তারই নাম সাধারণ জ্ঞান”।

সাধারণজ্ঞান আসলে এক ধরনের অভ্যস্ততা, কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এমপিয়ার ও ফ্যারাডের পরীক্ষা থেকে জানা গেল যে, বিদ্যুৎ ও চৌম্বকত্ব পরস্পর সম্পর্কিত। এই সম্পর্ককে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে ম্যাক্সওয়েল তার চারটি বিখ্যাত সমীকরণে প্রকাশ করেন। এই সমীকরণ ৪টিকে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ বলে। ম্যাক্সওয়েলের এই সমীকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী লুডভিগ এডুয়ার্ট বোলৎস্মান গ্যয়েতের লেখা উদ্ধৃত করেছিলেনঃ “স্বয়ং ঈশ্বর কি এই লাইনগুলি লিখে গেছেন“। এই সমীকরণ অনুসারে বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্র শক্তিবাহী তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে। হার্জস পরে পরীক্ষাগারে এই বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে এই তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান অর্থাৎ প = ৩০০০০০ কিলোমিটার/সেকেণ্ডে বা ১লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল প্রতি সেকেন্ড। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে এই দ্রুতির মান কখনো পরিবর্তন হয় না এটা একটি ধ্রুবক রাশি।

আমরা যত ধরনের আলো দেখি সেগুলোর সবই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। শব্দ তরঙ্গের চলাফেরার জন্য মাধ্যমের (যেমনঃ বাতাস) প্রয়োজন হয়, মাধ্যম ছাড়া শুন্যস্থানের মধ্যেদিয়ে চলাফেরা করতে পারে না। জল তরঙ্গের জন্য প্রয়োজন হয় জলের, জল ছাড়া এই ধরনের তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে না। তেমনি ধারণা করা হয়েছিল আলোরও চলাচলের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন। তবে পরীক্ষায় দেখা যায় যে একটি কাঁচের পাত্রের ভিতর একটি বৈদ্যুতিক ঘন্টা রেখে পাত্রটি সম্পূর্ণরূপে বায়ুহীন করে ফেললে

ঘন্টাবাজার শব্দ আর বাইরে থেকে শোনা যাবে না। কিন্তু পাত্রের ভিতর বৈদ্যুতিক বাতি রাখলে তার আলো বাইরে থেকে দেখা যাবে। আবার অতিদূর নক্ষত্রের আলো নিঃসিম শুন্যতার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে। আরও বলা যায় সুপারনোভার প্রলংকারী বিস্ফোরণে চিত্রও আমাদের কাছে আলোবাহিত হয়েই আমাদের কাছে আসে কিন্তু তার শব্দ আমরা কোনোদিনই আমরা শুনতে পাই না। এথেকে এতটুকু নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে আলোক তরঙ্গ ঠিক অন্যান্য তরঙ্গের (যেমন শব্দ) মতো নয়। অন্যান্য তরঙ্গের চলাফেরায় অপরিহার্য মাধ্যমগুলো আলোর জন্য প্রয়োজন নেই। যদিও কিছু মাধ্যমের মধ্যদিয়ে আলো চলতে পারে যাকে আমরা বলি স্বচ্ছ মাধ্যম। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে বিশাল শুন্যস্থানে বাতাস বা অন্য জাতীয় কোনো মাধ্যম নেই এটা ঠিক, কিন্তু একদম 'মাধ্যমহীন' শুন্যস্থানের মধ্যেদিয়ে আলো আসে কিভাবে? ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণেও মাধ্যমের উল্লেখ নেই, তাহলে এই সমীকরণ অনুসারে আলো যে ছড়িয়ে পড়ে তা কিসের সাপেক্ষ? আবার নিউটনের তত্ত্ব বলে পরম স্থিতি বলে কিছু নেই সব গতিবেগই আপেক্ষিক তাহলে কিসের প্রেক্ষিতে আলোর গতিবেগ? প্রতি সেকেন্ডে ১লক্ষ ৮৬হাজার মাইল একথার অর্থ কি? আর এই সব ঘটনা প্রবাহ পরম স্থিতিশীল কোনো মাধ্যম বা কাঠামোর চিন্তার দিকে ঠেলে দিল, অথচ 'পরম কাঠামো চিন্তা' থেকে আমরা নিউটনীয় তত্ত্বের মাধ্যমে মুক্ত হয়েছিলাম। এই অসুবিধাজনক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ম্যাক্সওয়েল ও অন্যান্য পদার্থবিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন যে, সমগ্র বিশ্বব্যপী একটি বিশেষ মাধ্যম আছে যার নাম ইথার। এই ইথার বস্তুর বাইরে আছে ভিতরেও আছে। বস্তুর গতি ইথারে বাধা প্রাপ্ত হয় না। বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তি এই মাধ্যমে সঞ্চিত করা এবং বিকিরণ করার জন্য প্রয়োজন হয় ইথারের স্থিতিস্থাপকগুণের। এই ধারণা সত্যি হলে সহজেই দেখানো যায় যে, নিউটনীয় আপেক্ষিকতার নীতি আলোক তরঙ্গের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। কারণ ইথারের প্রেক্ষিতে আলোর গতিবেগ যদি প হয় তবে গ্যালিলিও রূপান্তর সমীকরণ অনুসারে অন্য আরেকটি প্রসঙ্গ কাঠামো যা ইথারের প্রেক্ষিতে া গতিবেগে ধাবমান সেখানে আলোর গতিবেগ হবে পক্ন= প-া । সূতরাং যেহেতু বিভিন্ন জড় কাঠামোয় আলোর গতিবেগ বিভিন্ন। অতএব ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণও বিভিন্ন হবে। পৃথিবী তার অক্ষের চারিপাশে ঘূর্ণন এবং কক্ষের আবর্তনকালে অনায়াসে ইথারের মধ্যেদিয়ে চলে যায়। কক্ষপথে পৃথিবীর বেগ সূর্যের তুলনায় সেকেন্ড প্রায় ১৬মাইল। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো পর্যবেক্ষকের নিকট মনে হবে যেন ইথার এইবেগে তার তুলনায় প্রবাহিত হচ্ছে। এখন ভূ-পৃষ্ঠের আলোক উৎস হতে যদি আলোক প দ্রুতিতে চলতে থাকে তাহলে আলোর বেগ ইথারের তুলনায় প। কিন্তু যেহেতু ইথারের তুলনায় পৃথিবীর বেগ ১৬ মাইল/সেকেন্ড। তাহলে পৃথিবীর সাপেক্ষে আলোর বেগ (পৃথিবীর গতির দিকের উপর নির্ভর করে) হবে পা। এই ফলটি পাওয়ার জন্যই মাইকেলসন-মোর্লে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। সবদিকেই আলোর গতিবেগ প। ইথারের প্রেক্ষিতে পৃথিবীর গতিবেগ আলোর গতিবেগের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি।

মাইকেলসন-মর্লির ইন্টারফেরোমিটার পরীক্ষাটি বহুবার করা হয়েছে প্রত্যেকবারই একই ফল পাওয়া গিয়েছে, ১৯৫৮ সালে টাউনস ও তার সহকর্মীরা মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার করে এই পরীক্ষার পুণরাবৃত্তি করেন কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি ফল আগের মতোই হয়েছে।

মাইকেলসন-মর্লির ইন্টারফেরোমিটার পরীক্ষাটি বহুবার করা হয়েছে প্রত্যেকবারই একই ফল পাওয়া গিয়েছে, ১৯৫৮ সালে টাউনস ও তার সহকর্মীরা মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার করে এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি ফল আগের মতোই হয়েছে।

মাইকেলসন-মর্লির এই নেতিবাচক ফলাফল দুটো সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। প্রথমতঃ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইথার হাইপোথেসিস প্রমাণ করা অসম্ভব অর্থাৎ ইথারের কোনো পরিমাপক ধর্ম নেই- একদা যেটাকে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা মনে করা হয়েছিল তার কি হাস্যকর পরিসমাপ্তি। আর দ্বিতীয়টি হলো এই ফলাফল ইঙ্গিত করেছিল নতুন একটি ভৌত নিয়মের দিকে তাহলো আলোর গতি হলো উৎস ও পর্যবেক্ষকের গতি নিরেপেক্ষ। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেনি পৃথিবী। মানুষ হয়ে পড়েছিল নিউটনীয় বেড়াজালে বন্দী, তার থেকে প্রতিভাবানেরাও মুক্ত ছিল না। ৩শত বছরের নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য সাফল্যের ইতিহাস; তারফলে জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের সংস্কারবোধ এক ধরনের বিশ্বাস্ত যার কারণে পরীক্ষার ফলাফলও পুরোনো ধারণাকে ত্যাগ করতে বাধ সাধে। পৃথিবীর ইতিহাস বলে একটা সংস্কার থেকে আরেকটি সংস্কারে যাওয়া কখনোই পৃথিবীর জন্য সহজ হয়নি। যে নিউটনীয় গতিবিজ্ঞান এত চমৎকার ফলাফল দেয় সেই গতিবিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে গ্যালিলিও রূপান্তর সমীকরণে বৈধ সেই রূপান্তর সমীকরণকে বাদ দিয়ে নতুন কতগুলো সিদ্ধান্ত দেওয়া কী করে সম্ভব? নাহলে তো ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকেই বোঝা যেত আলোর গতির ধ্রুবতা। এই সমীকরণের মধ্যে আলোর গতি একটি ধ্রুবরাশি হিসেবে দেখা মেলে, তার চলার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গ্যালিলিও সমীকরণের মাধ্যমে তার রূপান্তর ঘটালে আলোর গতির এই অপরিবর্তনীয়তা আর থাকেনা। তার ফলে দাড়াচ্ছে বিভিন্ন দ্রুতিতে গতিশীল দর্শকের কাছে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ এক এক রকম। এটা পদার্থবিজ্ঞান কেন, যে কোন বিজ্ঞানের সাধারণীকরণের পরিপন্থী, প্রকৃতির নিয়মতো সর্বত্র একইরকম। আবার গ্যালিলিও সমীকরণকে বাদ দিয়ে নতুন ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বক তত্ত্বের জন্য নতুন রূপান্তর সমীকরণ দরকার। গতিবিজ্ঞানে এক ধরনের রূপান্তর সমীকরণ ও বিদ্যুৎ- চৌম্বক তত্ত্বে আরেক ধরনের রূপান্তর সমীকরণ তাওতো সাধারণীকরনের পরিপন্থী। তাহলে কি নিউটনের গতির সমীকরণে কোন ত্রুটি খুজে বের করা সম্ভব হবে এবং একটা রূপান্তর দু জায়গায়ই ব্যবহার করা যাবে? তা এক

প্রচন্ড দুঃসাহসী কাজ। এরজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আইনস্টাইনের মতো মহা প্রতিভাবানের।

কিন্তু তা আসার আগে মানুষের সংস্কারবোধ, মানুষের বিশ্বাস মাইকেলসন মোর্লির ইন্টারফেরোমিটারে চরম নেতিবাচক ফলাফলকেও ব্যাখ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, ইথার অস্তিত্বের বিশ্বাসকে রক্ষার জন্য। তারমধ্যে একটি হলো "ইথার" টানা প্রস্তাব। এই প্রস্তাব অনুসারে পৃথিবী ইথারকে তার সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। সূতরাং ইথারও পৃথিবীর সঙ্গে একই গতিতে ধাবমান। ফলে ইথারের গতিতো পৃথিবী সাপেক্ষে শুন্য হবেই। ইথার তত্ত্ব রক্ষার জন্য আর একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল আমরা যে আলোর গতি ব্যবহার করছি তা ইথার প্রেক্ষিতে নয় বরং উৎসের সাপেক্ষ ছিল এই দ্রুতি। সেক্ষেত্রে সমগ্র যন্ত্রটি ইথারের মধ্যে চলছে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু হল্যান্ডবাসী ডি-সিটার যুগ্মতারকা থেকে আসা আলোকে আলোচনা করে বললেনঃ এই যুগ্মতারা একটি আরেকটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এর একটি যখন পৃথিবীর দিকে আসতে থাকে তখন তার গতিবেগ আলোরবেগ প অপেক্ষাবেশি হবে আর তার সঙ্গী সেইসময় পৃথিবী থেকে সরে যেতে থাকবে ফলে তার থেকে যে আলোটা আসবে সেই আলোর গতিবেগ হবে প থেকে কম। কক্ষপথে ঘোরার কারণে কোনো এক সময় আবার আগেরটা সরে যাবে এবং পরেরটা কাছে আসবে অর্থাৎ উল্টো হবে। আলোর গতিবেগের এই পার্থক্যের কারণে নক্ষত্র দুটির কক্ষপথ বিকৃত বলে আমাদের কাছে মনে হবে। কিন্তু পর্যবেক্ষণে এধরনের কোনো বিকৃতি দেখা যায় না। এই সমস্ত সমস্যাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য আইনস্টাইন দুটো স্বীকার্য নিলেনঃ

> ১. পদার্থবিদ্যার সমস্ত নিয়ম সব জড়কাঠামোতে অভিন্ন থাকে। প্রকৃতির নীতিমালা জড় কাঠামোর উপর নির্ভরশীল নয়।
>
> ২. পদার্থশুন্য স্থানে আলোর গতিবেগ সকল জড় কাঠামোতে এক; উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতির উপর এই বেগ নির্ভরশীল নয়।

প্রথম স্বীকার্যটি মেনে নিলে জড়কাঠামোর সমগতি পদার্থবিদ্যার কোন পরীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। আইনস্টাইনের এই নীতি অনুসারে আপেক্ষিকতার নীতি গতির সূত্রাবলী হতে আরম্ভ করে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব পর্যন্ত প্রসারিত কিন্তু নিউটনের সময় তা ছিল না। এই স্বীকার্য অনুসারে আইনস্টাইন বললেন যে সুষম রৈখিক গতি সম্পন্ন সব জড়কাঠামো যদি আপেক্ষিকতার নীতি অনুসারে সমতুল্য হয় তবে এইসব জড়কাঠামোর যেকোনো একটিতে ইথার গতিহীন বা স্থির অবস্থায় আছে একথার কোনো মানে হয় না। দ্বিতীয় স্বীকার্যটি নিলে মাইকেলসন-মোর্লের পরীক্ষায় আলোক দ্রুতির ধ্রুবতার ফলাফল আমাদের আর সমস্যায় ফেলে না, ইথার নামক

অদ্ভুত মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। ডি-সিটারের যুগ্ম নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে আলোর গতিবেগের পার্থক্যের কারণে কেন নক্ষত্রদুটির কক্ষপথকে বিকৃত মনে হয় না তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ কারণগুলো থেকে বোঝা যায় আলোর দ্রুতি বস্তু জগতের অন্যান্য জিনিষের মত নয়। বস্তুর বেগ পর্যবেক্ষকের গতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এতে আলোর গতি প্রভাবিত হয় না। এক জায়গায় অবস্থান করা দুজন লোকের একজন সামনে টর্চ মারলো আর অপরজন ঐ টর্চের আলো বরাবর সেকেন্ড ১লক্ষ মাইল বেগে দ্রুতগতির মহাকাশযানে চলা শুরু করলো তাহলে আলোর দ্রুতি সাধারণ বুদ্ধিতে বা নিউটনের বেগ সংযোজনের নীতি অনুসারে তার কাছে হওয়া উচিত ছিল ৮৬হাজার মাইল। অথচ তার কাছেও ১লক্ষ ৮৬হাজার মাইল হবে। অথবা বিপরীত দিক থেকে কেউ ঐ বেগে আসলে তার কাছে আলোর গতিকে সেকেন্ড ২লক্ষ ৮৬হাজার মাইল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কাছেও আলোরগতিকে ১লক্ষ ৮৬হাজার মাইল হবে। আমাদের সাধারনজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে যতই অদ্ভুতই মনে হোক না কেন এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আইনস্টাইন ১৯৫৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মি. ড্যাভেনপোর্টকে লিখেছিলেন যে "আমার এরকম ধারণায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা বিবেচনাযোগ্য প্রভাবে প্রভাবিত করেনি।" এ থেকে বোঝা যায় আইনস্টাইনের প্রতিভা, যে তত্ত্বের প্রয়োজনে কিভাবে প্রকল্প বা স্বীকার্য বাছাই করতে হয়।

প্রবন্ধটি দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত